84 গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা সম্পর্কিত একটি জরীপঃ শেরপুর থানা

(প্রকাশকালঃ জুন, ১৯৯৪)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. এইচ এম আলাউদ্দিন, সহকারী পরিচালক
এম.এস.এস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ) ভূমিকা ঃ

তদানিন্তন ভারতবর্ষে বৃটিশদের আগমনের পূর্বে সমগ্র দেশে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল গ্রামের বিচার কার্য সম্পদন করা ও ঝগড়া-বিবাদের মিমাংসা করা ছিল পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বৃটিশরা প্রথমতঃ এ দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার উপর অর্পণ করতে চায়নি, কিন্তু পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের বেঙ্গল লোকাল গভর্ণমেন্ট আইনের অধীনে ইউনিয়ন বোর্ডকে তার আওতাভুক্ত এলাকায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলা বিচার করার একতিয়ার দেয়া হয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের বহুদিন পরে ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার সালিশী আদালত অধ্যাদেশ জারী করে। উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় ইউনিয়ন বোর্ডকে ইউনিয়ন পর্যায়ে সীমিত আকারে বিচার কার্য পরিচালনার মতা অর্পণ করা হয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কয়েক বৎসর ইউনিয়ন পরিষদেও উপর সরকারীভাবে বিচার করার কোন দায়িত্ব ছিলনা। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে ৬১নং অধ্যাদেশমূলে সরকার "গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ" প্রণয়নও জারী করেন। অধ্যাদেশটি ১৯৭৬ সালের ২০শে অক্টোবর বিশেষ সরকারী গেজেটে ঘোষণা পত্র নং-এস আর ও ৩৫-৪৭৬ এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৬ সালের ১লা নভেম্বর হতে কার্যকরী করা হয়। গ্রাম আদালত অধ্যাদেশটি দ্বারা ১৯৬১ সালের ৪৪নং "সালিশী আদালত অধ্যাদেশ" বাতিল করা হয়। উল্লেখ্য যে, গ্রাম আদালত মূলতঃ মীমাংসামূলক আদালত।

গ) উদ্দেশ্য ঃ

আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করেন। গ্রামের জনসাধারণ অধিকাংশই গরীব, তারা চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করছেন। এই দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে শহরে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা-মোকর্দ্দমা চালানো অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। গ্রাম পর্যায়ে যদি ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা ও মামলা-মোর্কদ্দমা নিস্পত্তির ব্যবস্থা থাকে তাহলে তারা অনেক বিড়ম্বনা ও খরচের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে। দ্রুত বিচার কার্য সম্পাদনের ফলে ঝগড়া-বিবাদের তীব্রতা, ব্যাপকতা ও পরিমাণ হ্রাস পাবে। বাংলাদেশে গ্রাম এলাকয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকারের প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

গ্রামের অধিকাংশ লোক যেমনি গরীব তেমনি অশিক্ষিত। তারা সাধারণ বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমা করতে গিয়ে প্রচুর টাকা-পয়সা ব্যয় করেন। কিন্তু গ্রাম আদালতে মামলা করতে গিয়ে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে মাত্র ২.০০ টাকার এবং দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে মাত্র ৪.০০ টাকার ফি প্রদান করতে হয়। কিন্তু একই ধরণের মামলা ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করতে গেলে প্রচুর পরিমানে অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া বাদী-বিবাদীকে নিজেদেরসহ মামলার স্বাক্ষী ও অন্যান্যদের খাওয়া, যাতায়াত খরচসহ বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। গ্রাম আদালতে মাত্র ২.০০ টাকা বা ৪.০০ টাকার ফি প্রদান করতে হয়। সেই টাকাও ইউনিয়নের জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামীণ টাউট বদমায়েসদের অবাধ বিচরণ অনেকটা কমে গিয়েছে। সামান্য কারণে এই ধরণের টাউট শ্রেণী গ্রামের জনসাধারণকে মামলার মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা টাকা রোজগারের পথ তৈরী করে নিত।

উচ্চতর আদালতগুলো অনেক সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমাগুলোই দ্রুত নিষ্পত্তির প্রতি বেশী নজর দিয়ে থাকেন। গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রাম পর্যায়ের মামলাগুলো গ্রাম আদালতেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ফলে উচ্চতর আদালতে মামলার পরিমানও হ্রাস পায়। উচ্চতর আদালতে আইনজীবিদের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্যও টাকা দিতে হয়। তাছাড়া বিজ্ঞ বিচারক স্বাক্ষীদের কাছ থেকে যে স্বাক্ষ্য-প্রমাণ পান তার উপর নির্ভর করেই মামলার রায় দেয়া হয়। কিন্তু গ্রাম আদালতের বিচার কার্যে মনোনীত বিচারকগণ বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য স্থানীয় অধিবাসী বিধায় অধিকাংশ এলাকাবাসী এবং মামলার পক্ষগণ তাদের পরিচিত। ফলে তারা সরেজমিনে গিয়ে মামলার তদন্ত করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী মামলার রায়ও দিতে পারেন। গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনগণ এর দ্বারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন বা জনগণ গ্রাম আদালত সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিবহাল তা জানাই হচ্ছে এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

এই গবেষণাটি শেরপুর থানার নয়টি ইউনিয়নের গ্রাম আদালতের কার্যাবলীর উপর পরিচালিত। বিগত ৫ বৎসরে শেরপুর থানায় মোট কতগুলো ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা হয়েছে, কতগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে, কতগুলো আপীলের জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরিত হয়েছে আবার কতগুলো বিচারাধীন রয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে জানাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য যা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১) শেরপুর থানায় গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনগণ কতটুকু অবহিত;

২) শেরপুর থানায় গঠিত গ্রাম আদালতগুলো ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি'না;

৩) বিগত ৫ বৎসরে গ্রাম আদালতগুলো কতগুলো ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেছে;

৪) গ্রাম আদালতের বিচার কার্যে সন্তুষ্ট না হয়ে কতজন লোক থানা পর্যায়ে আদালতের শরনাপন্ন হয়েছে (বর্তমানে থানা পর্যায়ের আদালতগুলো জেলা শহরে স্থানান্তরিত হয়ে এলাকা ভিত্তিক (থানা) বিচার কার্য পরিচালনা করছে);

৫) গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জনগণ সঠিক সময়ে সুবিচার পা"ছ কি'না সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

৬) ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম আদালত স্থাপিত হওয়ায় জনগণের কি ধরণের সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

ঘ) উপসংহার ঃ

গ্রাম আদালত মুলতঃ মিমাংসামূলক আদালত। এর ফলে বাদী-বিবাদীর মধ্যে একদিকে বিবাদের মিমাংসা হয় অন্যদিকে তাদের মধ্যে শান্তিও ফিরে আসে। গ্রাম আদালতে বিচার নিস্পত্তি হওয়ার কারণে শুধু গ্রামের জনসাধারণই উপকৃত হচ্ছেন না সামগ্রিকভাবে সর্বস্তরের জন্যসাধারণই এতে উপকৃত হচ্ছেন। গ্রাম আদালত শুধু গ্রামের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি সরকারের বিচার বিভাগের এটি অংশ এবং দেশের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করার জন্য আদালতের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারকদের সব সময় পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। বিচারের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনেক সময় আইনের কোন ধারা বা উপধারা সম্পর্কে কোন কিছুই বুঝেননা এবং আইনের কোন জটিল প্রশ্ন দেখা দিলে তার কোনরূপ ব্যাখ্যাও দিতে পারেন না। এই জন্য তাদেরকে গ্রাম আদালতের বিধি-বিধানের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন যাতে করে তারা এধরণের আইন-কানুন বুঝতে পারে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারেন। গ্রাম আদালতের কার্যপ্রণালী মাঝে-মাঝে পরিদর্শন ও তদারক করে দেখা উচিৎ। সর্বোপরি গ্রাম আদালতে বিচার প্রার্থনা করা, আদালতের রায় মান্য করা, রায় কার্যকরিতায় সহযোগিতা ইত্যাদি করার জন্য জনশিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন। এক কথায় গ্রাম আদালতের সফল কার্যকারিতার জন্য জনগণের সচেতনতার প্রয়োজন অপরিহার্য।

FLYING MAN
FLYING MAN